# আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন

## বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

**মেয়াদ ঃ ০২ দিন**


সম্পাদনা

## কৃষিবিদ মোহাম্মদ সায়েদুল হক

**সহযোগিতায়**

কৃষিবিদ আজমারুল হক

মোঃ মাঈনুদ্দীন

**ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)**

বাড়ী-১৮, রোড-০৫, ব্লক-এ মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬।

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯০০৫৪৫২,৮৮০-২-৯০১৪৯৩৩,

E-mail ঃ zalam_idf@yahoo.com

# আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর সময়সূচী

| দিন | সময় | প্রশিক্ষণের বিষয় | প্রশিক্ষণ পদ্ধতি | ফ্যাসিলিটেটর |
|---|---|---|---|---|
| ১ম দিন | ০৯:০০-১০.০০ | • রেজিষ্ট্রেশন<br>• প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী<br>• আইডিএফ পরিচিতি, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য<br>• উদ্বোধন | বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া, | |
| | ১০:০০-১১:৩০ | • বাংলাদেশে মৌমাছি পালনের সম্ভাবনা<br>• মধু, মধুর উপাদান, খাঁটি মধুর বৈশিষ্ট্য<br>• মৌমাছি পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন | বক্তৃতা, লিফলেট, মাল্টিমিডিয়া | |
| | ১১:৩০-১২:০০ | চা বিরতি | | |
| | ১২.০০-১.৩০ | • মৌমাছি পরিচিতি ও মধু উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত জাত<br>• মৌ মাছি পালনের উপযুক্ত পরিবেশ<br>• মৌচাক থেকে মোম সংগ্রহ | বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া, | |
| | ১.৩০-২.৩০ | দুপুরের খাবারের বিরতি | | |
| | ২:৩০-৪:৩০ | • মৌচাক তৈরী<br>• মৌমাছির খাদ্য<br>• মৌকলোনি স্থানান্তর | বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া, | |
| | ০৪:৩০-০৫:০০ | দিনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা | | |
| ২য় দিন | ০৯:০০-১১:০০ | • ফুলের পরাগায়ন<br>• মৌমাছি ও পরাগায়ন<br>• ফুলের পরাগায়নে মৌমাছির ভূমিকা | বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া, | |
| | ১১:০০-১১:৩০ | চা বিরতি | | |
| | ১১:৩০-১:০০ | • মৌ মাছির শত্রু এবং এর প্রতিরোধ | বক্তৃতা, লিফলেট মাল্টিমিডিয়া, | |
| | ১.০০-২.০০ | দুপুরের খাবারের বিরতি | | |
| | ২.০০-৪.০০ | • মৌ বক্স তৈরী করণ<br>• মৌ কলোনি স্থানান্তর<br>• মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করণ | ব্যবহারিক | |
| | ০৪:০০-০৫:০০ | প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী | ব্যবহারিক | |

# সেসন ঃ ১

- রেজিস্ট্রেশন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী
- আইডিএফ পরিচিতি, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- উদ্বোধন

### প্রশিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

১. প্রশিক্ষনের শুরুতেই সকল প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলতে হবে যেন তারা জড়তা ভেঙ্গে মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারেন।
২. যতখানি সহজ ভাষায় বোঝানো সম্ভব তার চেষ্টা করা।
৩. প্রশিক্ষনার্থীদের জ্ঞানের ও বোঝার স্তর যেভাবে আছে ততটুকু বোঝাতে হবে।
৪. প্রতিটি বিষয় শুরুর প্রথমেই প্রশিক্ষনার্থীদের কাছে প্রশ্ন করে তাদের অভিজ্ঞতা যাচাই করে নেয়া।
৫. কোন আলোচনার পর তাদের কাছে প্রশ্ন করে দেখতে হবে তারা কতটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছে।
৬. যতটা সম্ভব ব্যবহারিক ও ছবির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা।
৭. মডিউলের কথাগুলো হুবহু বলার দরকার নেই, প্রশিক্ষণার্থী গণের বোঝার সক্ষমতা ও প্রশিক্ষণের পরিবেশ অনুযায়ী বলতে হবে ।

### প্রশিক্ষনের নীতিমালা

১. সঠিক সময়ে ক্লাশে উপস্থিত হওয়া।
২. ক্লাশে আন্তরিক পরিবেশ বজায় রাখা।
৩. একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
৪. পাশাপাশি কথা না বলা।
৫. এক সঙ্গে সবাই বা একাধিক জনে কথা না বলা।
৬. কোন বিষয় না বুঝলে অবশ্যই তা প্রশ্ন করে জেনে নেয়া।
৭. কেউ প্রশ্ন করতে চাইলে তাতে বাঁধা না দেয়া।

## আইডিএফ পরিচিতি

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন “আইডিএফ” গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মস এর সোসাইটিজ ACT XXI OF ১৮৬০ এর অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত এস-১৫৫১(১১১)/৯৩ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও আইডিএফ বাংলাদেশ সরকারের এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নম্বর ঃ ৯৪১,তারিখ ২৮/০৫/১৯৯৫ইং) এবং মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (সনদ নংঃ-০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯,তারিখ-১৪/০৫/২০০৮ইং) তে নিবন্ধন প্রাপ্ত। বিনা জামানতে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগণকে ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত করতেই এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে আইডিএফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মকান্ড শুরু হয় ১৯৯৩ থেকে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, বিশুদ্ধ পানি, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরণ, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ভিক্ষুক কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা,রাজশাহী, নাটোর, গাজীপুরসহ মোট ১৩ টি জেলায় ৭৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে অত্র সংস্থা ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরন, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ডিগনিটি কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতাধীন জেলা ছাড়াও সৌরশক্তি কর্মসূচী ফেনী, নোয়াখালী, চান্দপুর, কুমিল্লা জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে ।

আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জহিরুল আলম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা কালেই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় চাকুরী শেষে ১৯৯২ সালে দেশে ফিরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ শুরু করেন। নোবেল বিজয়ী ড ঃ মোহাম্মদ ইউনূস, তাঁর সহকর্মী, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগণ এ সময়ে তাঁকে এ কাজে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগান। ১৯৯৩ সালে গ্রামীণ ট্রাস্টের সহযোগীতায় বান্দরবান জেলার সুয়ালক মৌজায় "সুয়ালক শাখা" শাখার মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

# সেসন ঃ ২

- **বাংলাদেশে মৌমাছি পালনের সম্ভাবনা**
- **মৌমাছি পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন**
- মধু, মধুর উপাদান, খাঁটি মধুর বৈশিষ্ট্য

**বাংলাদেশে মৌমাছি পালনের সম্ভাবনা ঃ**

বাংলদেশের ও মৌমাছি পালনকে একটি সম্মাবনাময় খাত হিসেবে গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । আমাদের দেশে মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে এখন ও তেমন উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয় নাই। এছাড়া সাধারণ পর্যবেক্ষনে লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের মৌ পালনকারীগনের অধিকাংশেরই রয়েছে কারিগলি জ্ঞানের অভাব । এছাড়াও ক্রটিযুক্ত মৌবাক্সে এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির অভাব ইত্যাদি ও মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় । এতদসত্ত্বে ও একটি সমীক্ষ থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে কলোনি প্রতি মধুর বার্ষিক গড় উৎপাদন ৪ থেকে ১০ কেজি এবং কলোনি প্রতি বার্ষিক নিট গড় আয় ১৯ (Appropriate technology)তে এবং ২৮ (Advance technology) তে মার্কিন ডলার। তবে ইতোমধ্যে দেশে *Apis mellifera* প্রজাতির পালন শুরু হয়েছে। এ প্রজাতিটির বার্ষিক মধুর গড় উৎপাদন ৪০ থেকে ৫০ কেজি। আমাদের দেশে মৌমাছি পালন এখন ও মূলত মধু উৎপাদন করছেন। এছাড়া পরাগ মৌ-আঠা রয়েল জেলি ইত্যাদির উৎপাদন আমাদের দেশে মৌমাছি পালন এখন ও মূলত মধু উৎপাদন ভিত্তিক। কিছু কিছু মৌমাছি পালনকারী সম্প্রতি বিক্রয়ের জন্য মৌকলোনি উৎপাদন করছেন এছাড় পরাগ মৌ-আঠা রয়েল জেলি ইত্যাদি উৎপাদন আমাদের দেশে নেই।

ছবি ঃ সরিষা ক্ষেতে মৌ বক্স

ছবি ঃ আম ও লিচু বাগানে স্থাপিত মৌ বক্স

**মৌমাছি পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ**

মৌমাছি পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এমন বিশ্বব্যাপী সু-প্রতিষ্ঠিত । এ কারণে সমগ্র বিশ্বে মৌমাছি পালন দ্রুত প্রসার লাভ করছে এবং এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ঘটছে । ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, মৌমাছি পালনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় প্রকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। যেমন-মৌমাচি পালনের মাধ্যমে পরাগ সংযোগের ফলে শস্যের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বর্ধিত ফসলের মূল্য হচ্ছে পরোক্ষ আয়। এরপর মৌকলোনি থেকে

উৎপাদিত মধুসহ অন্যান্য উপজাত যেমন মোম, রয়েল জেলি, মৌ আঠা ইত্যাদি থেকে উৎপাদিত মূল্য হচ্ছে প্রত্যক্ষ আয়। বিশ্বের অনেক দেশই এখন ঝুকে পড়েছে মৌমাছি পালনের দিকে। চীন বর্তমানে ৪০টির ও বেশি দেশে মধু রপ্তানি করে। শুধূ তাই নয় প্রতি বছর জাপান আমেরিকাসহ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে ৩০০ থেকে ৪০০টন রয়েল জেলি রপ্তানি করে। আমাদের নিকট প্রতিবেশী নেপালও একটি মধু রপ্তানিকারণক দেশ হিসেবে প্রতিষ্টা লাভ করেছে। নেপাল তাদের উৎপাদিত মধূ জাপান হংকং, কোরিয়া, কানাডা, জার্মানী, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, পোল্যাডসহ আরো কয়েকটি দেশে রপ্তানি করে। নেপালে *Apis cerana* এবং *Apis mellifera* প্রজাতির মৌমাছির বার্ষিক গড় মধু উৎপাদন যথাক্রমে ৮ থেকে ২ কেজি এবং ৪০ থেকে ৬০ কেজি। এ দুটি প্রজাতি ব্যতিরেকে ও তারা ৩টি বন্য প্রজাতি যেমন *Apis dorsata, Apis laboriosa* এবং *Apis florea* প্রজাতির মৌমাছির মধু ও সংগ্রহ করে। এ মধুগুলোকে তারা প্রাকৃতিক উচু পাথুরে পর্বতের মধু নামে অভিহিত করে এবং এগুলো ও রপ্তানি করে।

**মধু, মধুর উপাদান, খাঁটি মধুর বৈশিষ্ট্য ঃ**

**ছবি ঃ বোতলজাত মধু**

ফুলের নেকটার থেকে মৌমাছি যে ঘন, মিষ্টি ও আঁঠালো তরল পর্দার্থ তৈরি করে তাকে মধু বলে। মধু সম্পর্কে অনেকেরই এরকম একটি ধারণা যে, মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। বস্তুত বিষয়টি সেরকম নয়। মৌমাছি ফুল থেকে মধু তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করে। ফুলে বিচরণকালে মৌমাছি তাদের লম্বা চোষকের সাহায্যে ফুলে থাকা এক প্রকার মিষ্টি তরল রস সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত এ রস তাদের বিশেষ পাকস্থলী বা মদু-পাকস্থলীতে জমা করে। ফুলের এ মিষ্টি তরল রসকে ফুলের নেকটার বলে। এ নেকটারই হচ্ছে মধু তৈরির একমাত্র কাঁচামাল। ১০০ গ্রাম মধূ তৈরির জন্য মৌমাছিকে প্রায় ১০ লক্ষ ফুলে বিচরণ করতে হয়। তবে ফুলের নেকটার সমৃদ্ধতার উপর এটি অনেকাংশে নির্ভরশীল একটি মৌমাছি তার মধু-পাকস্থলী পূর্ণ করে একবার নেকটার বহন করাকে একটি নেকটার বোঝা বলে। এক কিলোগ্রাম মধূ তৈরির জন্য মৌমাছির একলক্ষ কুড়ি হাজার থেকে দেড় লক্ষ নেকটার বোঝা বহন করতে হয়। মৌচাক থেকে যদি নেকটারের উৎসস্থল ১৫০০ মিটার দুরত্বে হয় তবে প্রতিটি নেকটার বোঝার জন্য তাদের উড়তে হয তিন কিলোমিটার পথ। সুতরাং এক কেজি মধুর জন্য তাদের সর্বমোট তিন লক্ষ ষাট হাজার থেকে সাড়ে চার লক্ষ কিলোমিটার দুরত্ব উড়তে হয়। নেকটার সংগ্রহ করে মৌমাছি তাদের মৌচাকে ফিরে আসার পথেই তাদের মধু-পাকস্থলীতে এনজাইমের ক্রিয়ায় নেকটারের দ্বি-শর্করা গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজে রুপ নেয় এবং সেখানে তা এনজাইম, এনজাইম জৈব এসিড এন্টিবায়োটিকস ও অন্যান্য পদার্থে সমৃদ্ধ হয়। নেকটার বহনকারী শ্রমিক মৌমাছিরা মৌচাকে ফিরে এসে বহনকৃত নেকটার উৎগীরণ করে মৌচাকের কোষে রেখে পুনরায় নেকটার সংগ্রহের জন্য চলে যায়। এদিকে মৌকলোনির গৃহবাসী শ্রমিকেরা এ নেকটারকে আবার ও তাদের মধু-পাকস্থলীতে নিয়ে নেয় এবং এখানে ও একটি জটিল প্রক্রিয়া চলতে থাকে । এ সময় গৃহবাসী শ্রমিকেরা মৌচাকে বসে বসে মধু-পাকস্থলী থেকে একবিন্দু করে নেকটার উগরে বাইরে এনে আবার গিলে ফেলে। এপ্রক্রিয়াটি অন্তত ১২০ থেকে ২৪০ বার চলতে থাকে। এ প্রক্রিয়াটিকে নেকটার পরিপক্ককরণ প্রক্রিয়া বলে। এরপর তারা নেকটারটুকু মৌকোষে জমা রাখে। ফুল থেকে নেকটার সংগ্রহকালে নেকটার শতকরা ৪০ থেকে ৮০ ভাগ জলীয় অংশ থাকে। এ নেকটার মধুতে পরিণত করতে হলে জলীয় অংশের পরিমাণ কমিয়ে শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগে উপনীত করতে হয়। সুতরাং নেকটারকে মধুতে রূপান্তরিত করতে জলীয় অংশের বাস্পীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশ্য নেকটার মৌমাছির মধু-পাকস্থলীতে অবস্থানকালেই এর জলীয় অংশের ঘনীভবনের কাজ শুরু হয়। কেননা মৌমাছি মধু-পাকস্থলীর কোষসমূহে নেকটারের কিছু জলীয় অংশ পরিশোধিত হয় এবং যেখান থেকে জলীয় অংশ রক্তের সাথে মিশে ম্যালপিজিয়ান নালীকায় গিয়ে

পৌছায়। বহনকৃত নেকটারন মৌচাকে রাখার পর মৌকলোলির গৃহবাসী মৌমাছিরা নেকটারকে এককোষ থেকে অন্য কোষে বারবার স্থানান্তরের মাধ্যমে ও এ বাস্পীকরণের কাজ চালিয়ে যায়। এছাড়া ও তারা ডানা নেড়ে নেড়ে মৌচাকে অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করে ও বাস্পীভবনের কাজ করে। এ ক্ষেত্রে তারা প্রতি মিনিটে চাব্বিশ হাজার বারের ও বেশি সংখ্যক বার ডানা নেড়ে বাতাস করে। নেকটারের জলীয় অংশের বাস্পীভবনের কাজ সমাধা হলে অর্থাৎ জলীয় অংশের পরিমাণ শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগে উপনীত হবার পর মৌমাছিরা মোম দিয়ে একটি পাতলা আস্তরণের সাহয্যে কোষের মুখ বন্ধ করে দেয়। কোষ বন্ধ এ মধু বায়ুরোধক অবস্থায় থাকার ফলে বহু বছরে ও এ মধু নষ্ট হয় না।

**মধুর রাসায়নিক উপাদানঃ**

মধু বিভিন্ন সমৃদ্ধশালী উপাদানে গঠিত। মধুর বিভিন্ন উপাদানের শতকরা পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো।--

| **ক.প্রধান উপাদানের নাম** | **শতকরা পরিমাণ** |
|---|---|
| গ্লুকোজ (ডেকস্ট্রোজ) | ৩৫ ভাগ |
| ফ্রুক্টোজ (লেভিউলোজ) | ৪০ ভাগ |
| পানি | ১৮ ভাগ |
| অন্যান্য চিনি | ৪ ভাগ |
| অন্যান্য পদার্থ | ৩ ভাগ |

**খ. শর্করা জাতীয় উপাদান**

ইনভারটেজ, ডায়াসটেজ, স্যাকারেজ,ক্যাটালেজ,লাইপেজ,পারক্সিডেজ

**গ. আকরিক ও মৌলিক উপাদান**

ক্যালসিয়াম, কপার, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, জিঙ্ক

এছাড়াও কিছু কিছু মধুতে ক্লোরিন, সালফার ,রোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, বোরণ,লিথিয়াম, নিকেল,সিলিকন, সিলিকা ইত্যাদিরও উপস্থিতি রয়েছে।

**ঘ.এসিড**

ফরমিক এসিড, ম্যালিক এসিড,টার্টারিক এসিড, গ্লুকোলিক এসিড,এসকারিক এসিড,এসিটিক এসিড,সাইট্রিক এসিড, বিউটারিক এসিড, সাকসিনিক এসিড, লাকটিক এসিড

**ঙ.ভিটামিন**

থায়োমিন, রিবোফ্লাভিন, প্যানটোথেনিক এসিড, নিয়াসিন, পাইরিডক্সিন, অ্যাসকরবিক এসিড

**.আমিষ**

প্রায় সাত থেকে আট প্রকারের আমিষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

**খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য উপাদান:**

মধুর রাসায়নিক উপাদানের যে শতকরা পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে তা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন ফুলের নেকটারের কারণে কিছুটা হলেও তারতম্য হতে পারে। যেমন- কালচে রঙের মধু সধিারণত অধিক খনিজ পদার্থ সমৃদ্ব হয়ে থাকে। এছাড়া ও বিভিন্ন ফুলের মধু, যেমন- আপেল ফুলের মধুতে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজের শতকরা হার ৩৯.৬৭ও ৪২.৫৭, ভাগ, মটর ফুলের মধুতে এ হার যথাক্রমে ৩৬.৭৯ও ৩৯.৫৯, আবার কার্পাস মধুতে গ্লুকোজ রয়েছে শতকরা ৩৬.১৯ ভাগ।

**মধুর বৈশিষ্ট্য:**

ভিন্ন ভিন্ন ফুলের নেকটারের ভিন্নতার জন্য মধুর উপাদানসমূহের শতাংশের তেমন উল্লেখযোগ্য তারতম্য না ঘটলেও ফুলের নেকাটারের কারণে মধুর রঙ, স্বাদ ও গন্ধের বেশ তারতম্য রযেছে। যেমন সূর্যমুখীর মধু সোনালি হলুদ ও এর স্বাদ কিছুটা কষযুক্ত, তামাক ফুলের মধু গাঢ় রঙের ও স্বাদ কটু, গাজরের মধু কালচে, মটর, লিচু, সাজনা ইত্যাদি ফুলের মধু পানির ন্যায় স্বচ্ছ এবং বেশ সুস্বাদু। আবার কিছু কিছু মধু রয়েছে, যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি দানা বাঁধে যেমন- সরিষা, কার্পাস, সূর্যমুখী, আপেল, মটর ইত্যাদি ফুলের মধু। আমাদের দেশে অনেক সময় দানা মধুর গুনগত

মান সম্পর্কে অনীহা লক্ষ্য করা যায় এবং এর বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত ঠান্ডায় মধু বেশি দিন সংরক্ষিত অবস্থায় থাকলে মধুর গ-ুকোজ দানা বেঁধে যায়।আর এক্ষেত্রে যদি মধুতে বিদ্যামান গ-ুকোজের পরিমাণ বেশি থাকে ( যেমন- সরিষা ও সূর্যমূখী ফুলের মধু), তবে এ দানা বাধাঁর প্রক্রিয়াটি আরও ত্বরান্বিত হয়।

**বিশুদ্ধ মধুর বৈশিষ্ট্য:**

বিশুদ্ধ বা খাঁটি মধু নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য অধিকারী-

১. বিশুদ্ধ মধু দেখতে স্বচ্ছ হয় এবং এর মধ্যে কোনো ঘোলাটে ভাব থাকে না।
২. ঘন ও আঠালো হয়।
৩. আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বোচ্চ ১.৪০ হয়।
৪. জলীয় অংশের পরিমাণ শতকরা ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ২০ হয়।
৫. অম্লত্ব সর্বনিম্ন শতকরা ০.৪০ থেকে সর্বোচ্চ ০.৭৫ হয়।
৫. সুক্রোজের পরিমাণ কোনো ক্রমেই শতকরা ৫ ভাগের বেশি হয় না। অর্থাৎ সুক্রোজের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের বেশি থাকলে মধুতে বেজাল রয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে।
৬. সাধারণত ১০ ডিগ্রী থেকে ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দানা বাঁধে।

# সেসন ঃ ৩

- মৌমাছি পরিচিতি ও মধু উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত জাত
- **মৌ মাছি পালনের উপযুক্ত পরিবেশ**
- **মৌচাক থেকে মোম সংগ্রহ**

## মৌমাছি পরিচিতি ঃ

মৌমাছিদের জীবনের ধারাবাহিকতা এবং অস্তিত্ব বজায় রয়েছে হাজার হাজার মৌমাছির নিরলস কর্মময় জীবসের উপর ভিত্তি করে। মৌকলোনিতে বিদ্যামান তিন প্রকার মৌমাছির একে অপরের সম্পূরক। এদের সকরের জন্য রয়েছে বিভিন্ন কর্মবিভাগ,যার সামান্য ব্যাত্যয় এদের জীবনে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। রাণী মৌমাছির প্রধান ও অন্যতম কাজ হচ্ছে বংশধারাকে অব্যাহত রাখতে ডিম দেয়া। রাণী ডিম দেয়ার পূর্বে মৌচাকের প্রতিটি কুঠিরের উপযোগীতা পরীক্ষা করে নেয়। নোংড়া, অপরিচ্ছন্ন ও অধিক পুরানো মৌ কুঠরিতে রাণী ডিম দেয় না। একইভাবে একটি মৌ কুঠরিতে একই সাথে একাধিক ডিম দেয় না। রাণী প্রায় সারাবছরব্যাপি ডিম দেয়, তবে ঋতুভেদে এর

মাত্রা কম বেশী হয়ে থাকে। রাণী মৌমাছির ন্যায় পুরুষ মৌমাছিও প্রধানত একটি নিদিষ্ট কাজ সম্প্রদান করে। সে শুধু কুমারী রাণীর সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমে তার ডিমকে নিষিক্ত করে। এছাড়া অতিরিক্ত গরমে মৌকলোনির ভিতরে তাপের সমতা রক্ষায় তারা অনেক সময় শ্রমিক মৌমাছিকে সাহায্যে করে।

শ্রমিক মৌমাছি হচ্ছে মৌকলোনির মূল কর্মীবাহিনী। শ্রমিক মৌমাছি সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণক কাজ গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. ফুলে ফুলে বিচরণ করে ফুলে নেকটার ও পরাগ সংগ্রহ করা।
২. সংগৃহিত ফুলের নেকটার কে মধুতে রূপান্তরিত করা।
৩. সংগৃহিত পরাগ মধুর সাথে মিশ্রিত করে মৌরুটি(Bee breed) নামক বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করা।
৪. মৌকলোনির জন্য প্রয়োজনীয় পানীয় সংগ্রহ করা।
৫. মৌ-আটা সংগ্রহ বা প্রস্তুত করে সেগুরো দিয়ে মৌকলোনির প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা।
৬. রয়েল জেলি নামক বিশিস খাদ্র প্রস্তুত করা।
৭. মোমগ্রন্তি থেকে মোম নিঃসৃত করে সেগুলো রাণীর ডিম দেয়ার উপযোগী করা।
৮. মৌকুঠরি পরিষ্কার করে সেগুলো রাণীর ডিম দেয়ার উপযোগী করা।
৯. মৌকুঠরিস্থ ডিম, শূককীট ও মূককীটে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরাবরাহ করা।
১০. মৌকুঠরির মূককীট কোষে ও পরিপক্ক মধুপূর্ণ (ripe honey) কুঠরিতে বায়ুরোধক আস্তরণ দেয়া।
১১. রাণী মৌমাছির সেবা করা এবং তাকে খেতে দেয়া।
১২. অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডায় মৌকলোনিতে তাপের সমতা রক্ষা করা।
১৩. শত্রুর কবর থেকে মৌকলনি রক্ষার জন্য প্রহরার ব্যবস্থা করা,এবং প্রয়োজনে শত্রুকে আক্রমণের মাধ্যমে প্রতিহত করা।
১৪. খাদ্য পানীয় জল , বাসস্থান ইত্যাদির নতুন নতুন উৎস্য অনুসন্ধান করা।
১৫. মৌকলনিতে প্রয়োজনীয় মধু ও পরাগের পরিমান নিশ্চিত করা।
১৬. মৌকলনির অভ্যান্তরে সব ধরনের পরিচ্ছন্নতার নিশ্চয়তা বিধান করা।
১৭. নতুন রাণীর জন্মের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

শ্রমিক মৌমাছির বিশাল কাজের পরিধি সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয শুধু তাদের কাজের নিয়মানুবর্তিতার জন্য। প্রত্যেক শ্রমিক মৌমাছির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম বিভাজন রয়েছে এবং এ কর্ম বিভাজন সু বিবিন্যাস্ত করা হয়েছে এদের বয়সের উপর নির্ভর করে। মৌমাছির এমন কিছু কিছু কাজ রয়েছে যা এদের বয়সের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরুপ মৌমাছির হুলের বিষয় উল্লেক করা যেতে পারে- জন্মের প্রথম দিনে এদের বিষথলি কর্মক্ষম থাকে না এবং এরা হুল ফোটাতে ও পারে না। সুতরাং এ বয়সের শ্রমিকেরা শত্রুর আক্রমণ থেকে মৌকলনিকে রক্ষার কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে না। এছাড়া ও শ্রমিকদের মোমগ্রন্থি একটি নিদিষ্ট বয়সে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং একটি নিদিষ্ট বয়স পর্যন্ত এদের কার্যকারিতা বজায় থাকে। সুতরাং ঐ নিদিষ্ট বয়সের শ্রমিকেরা মোম উৎপাদকের কাজ করে। শ্রমিক মৌমাছিদের আত্নরক্ষার জন্য হুল ফোটানো, মৌচাক তৈরি বা অণ্যান্য কাজ গুলো মূলততাদের সহজাত আচরণ (instinetive behaviour)। প্রাণি বিজ্ঞানের ভাষায় সহজাত আচরণ বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে একটি প্রজাতির অন্তভুক্ত প্রতিটি প্রাণি কোন রকম শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যাতিরক জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে বা আত্নরক্ষার তাগিদে রংশপরস্পরায় একইভাবে যেসব জন্মগত অপরিবর্তনীয় আচরণ প্রদর্শন করে তাকে সহজাত আচরন বলে।সহজাত

আচরণের আবাার বেশ কিছু বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে। যেমন এ আচরন বংশগত বা জীন নিয়ন্ত্রিত। সহজাত আচরণ জন্মগত হলে ওসব সহজাত আচরণ জন্মের সময় থেকে আত্নপ্রকাশ করে না। পরিপক্কতার ভিতর দিয়ে উপযুক্ত সময়ে তাদের বিকাশ ঘটে।

**ছবি ঃ রাণী মৌমাছি**

**রাণী কোষ বা রাণী কুঠরিঃ**

মৌচাকে রাণী মৌমাছি জন্ম হয় রানীকোষ থেকে। রাণীকোষ মৌচাকের কোন সাধারণ অংশ নয়। এছাড়া ও এগুলোকে সবসময় মৌচাকে দেখা দেয় না। শুধু রাণী জন্মের প্রয়োজনেই শ্রমিক মৌমাছিরা রাণী কোষ তৈরি করে। রাণী কোষ থেকে রাণী জন্ম হীয়ার পর সে রাণীকোষটির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি রাণী কোষ শুধু একেবারেই ব্যবহার হয়। পূর্ণাঙ্গ একটি রাণী কোষ দেখতে প্রায় একটি বাদামের ন্যায়। মৌমাছির প্রজাতি ভেদে যেমন রাণী মৌমাছির আকার ছোট বড় রয়েছে , তেমনী রাণী কোষের ক্ষেত্রেও এর আকার ভিন্ন হয়ে থাকে। *Apis mellifera* প্রজাতির ক্ষেত্রে রাণীকোষ সাধারণত ২৫ মি.মি. লম্বা হয়। *Apis cerana* প্রজাতির ক্ষেত্রে এটি লম্বায় *Apis mellifera* প্রজাতির চেয়ে লম্বা ও ব্যাসে ছোট। রাণী কোষের রঙ অনেকটা গাঢ় বাদামি রঙের। রাণীকোষ তৈরির প্রাথামক পর্যায় দেখতে অনেকটা কাপের ন্যায়।এবং রাণী কোষের এ পর্যায়টিকে বলা হয় কুইন কাপ। কুইন কাপ হচ্ছে রাণী কোষ তৈরির পূর্ব সূচক। এগুলো মৌচাকের প্রান্তে দেশে নির্মিত হয়। কুইন কাপে দেওয়া রাণী মৌমাছির নিষিক্ত ডিমে শ্রমিক মৌমাছি রক্রমাগত ভাবে প্রচুর পরিমানে ( ৩২৫ মি.গ্রা.) রয়েল জেলি সরাবরাহ করতে থাকে। অধিক পরিমান রয়েল জেলির প্রভাবে কোষস্থ শূককীট সাধঅরণ শ্রমিকের শূককীটের তুলনায় অনেক বড় হতে থাকে। তখন শ্রমিক মৌমাছিরা কুইন কাপ টি কে আকারে বুদ্ধি করে এক পর্যায়ে লম্বা আকৃতিতে রূপান্তরিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ রাণী কোষে পরিণত করে। পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রাণী কোষ সাধারণত মৌচাকের নিচের অংশে বা পাশে অর্থাৎ প্রান্তদেশে তৈরি হয়ে থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৌচাকের মাঝেও দেখা দেখা যেতে পারে। একটি মৌকলোনিতে নতুন রাণীর জন্মের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এ কারণ সমূহের উপর ভিত্তি করে রাণী কোষকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ-

**বংশবৃদ্ধির জন্য রাণী কোষ ঃ**

বসন্ত ঋতু অর্থাৎ মৌমাছির প্রজনন ঋতুতে (কখনো কখনো শরৎকালেও হতে পারে) মৌমাছিরা বংশবৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন মৌকলোনি তৈরির উদ্যোগ নেয়। নতুন মৌকলোনির জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত রাণী মৌমাছি। সুতরাং এ রাণী জন্মোর জন্য মৌকলোনিতে রাণী কোষ তৈরি হতে থাকে। এ রাণী কোষ গুলো হচ্ছে বংশবৃদ্ধির জন্য রাণী কোষ বা সোয়ার্ম কুইন সেল। এ কোষগুলো মৌচাকের নিচের দিকে প্রান্ত দেশে উৎপন্ন হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। একটি মৌকলোনিতে এ ধরনের রাণীকোষের সংখ্যা অনেকগুলো হয়ে থাকে। এটি অনেকাংশ নির্ভর করে মৌমাছির সংখ্যার উপর। তবে সাধারণ ভাবে একটি শক্তিশালী *Apis cerana* কলোনিতে ৪/৫ টি তেকে শুরু করে ১০/১২ টি এবং *Apis mellifera* প্রজাতির ক্ষেত্রে ৫ তেকে ৩০ টি পর্যন্ত হতে পারে। যেহেতু রাণী কোষ বংশ বৃদ্ধির কারণে সুতরাং এগুলো মৌকলোনির একটি অনিবার্য প্রাকৃতিক নিয়ম।

**জরুরী অবস্থায় রাণী কোষঃ**

কোন কারণ বসত মৌকলেনির রাণীর মৃত্যু ঘটলে বা যে কোন ভাবে রাণী মৌকলোনি থেকে অপসারিত হলে রাণীবিহীন মৌকলোনির মৌমাছিরা রাণীর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। এ অবস্থায় তারা জরুরী ভিত্তিতে রাণীর জন্মোর

উদ্যোগ গ্রহণ করে। নতুন রাণীর জন্য প্রথমেই শ্রমিক মৌমাছিরা মৌচাকে রাণী কোষ আছে কি না সেদিকে দৃষ্টি দেয়। যদি মৌচাকে রাণী কোষ না থাকে তবে তারা জরুরীভাবে রাণী জন্মের জন্য উদ্যোগ নেয়। এক্ষেত্রে মৌকলোনি রাণীবিহীন হবার ৪ ঘন্টার মধ্যে ১ দিন বা ২ দিন বয়সের শ্রমিক মৌমাছির শূককীট কে নির্বাচন করে শ্রমিক কোষ গুরোকে রাণী কোষে রূপান্তরিত করে এবয় একই ধারায় এগুলোতে অবিরত রয়েল জেলি সরাবরাহ করে।জরুরী ভিত্তিতে এ রাণী কোষ গুলো নির্মিত হয় বিধায় এগুলোকে জরুরী অবস্থায় রাণী কোষ বা ইমারজেন্সি কুইন সেল বলে। এ রাণী কোষ থেকে জন্ম নেওয়া রাণী কে ইমারজেন্সি কুইন বলে। এ রাণী কোষ গুলো মৌচাকের যে কোন স্থানেই অর্থাৎ প্রান্তদেশে অথবা মৌচাকের মাঝে উভয় স্থানে নির্মিত হতে পারে। এদের সংখ্যা ও অনেক হয়ে থাকে। *Apis mellifera* প্রজাতির ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ১০ তেকে ৩০ টি পর্যন্ত হতে পারে।

**সুপারসিডিউর রাণী কোষ ঃ**

মৌকলোনিতে রাণী মৌমাছি বৃদ্ধা, অসুস্থ, ডিম দেয়ার অনুপযোগী অথবা অন্য কোন সঙ্গত কারণে শ্রমিকদের নিকট অগ্রহণযোগ্য হলে রাণীর উপস্থিতি সত্তেও শ্রমিক মৌমাছিরা রাণী মৌমাছি তৈরির উদ্যোগ গ্রহন করে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে রাণী জন্মের লক্ষে সৃষ্ট রাণী কোষ কে সুপারসিডিউর রাণী কোষ বলে। মৌকলোনিতে নতুন বা কর্মক্ষম রাণী সংযোজনই হচ্ছে এ রাণী কোস তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য। এ রাণী কোষ গুলো সাধারণত মৌচাকের মাঝখানে দেখা যায়। *Apis cerana* প্রজাতির কলোনিতে এ রাণী কোষের সংখ্যা সাধারণত ১ থেকে ৩ টি এবং *Apis mellifera* প্রজাতির ক্ষেত্রে ১ থেকে ১০ টি হতে পারে।

**মৌ মাছি পালনের উপযুক্ত পরিবেশঃ**

সফলতার সাথে মৌমাছি পালনের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে মৌমাচি পালন উপযাগী পরিবেশ। মৌমাছির খাবরের একমাত্র উৎস্য হচ্ছে ফুল। সুতরাং পুষ্পধারী ঘন গাছপালা সমৃদ্ধ হচ্ছে মৌমাছি পালনের উপযোগী স্থান। মধু পুষ্পধারী বৃক্ষের সমাবেশ হলেই উপযোগী এলাকা নাও হতে পারে। কেননা মৌমাছি সব ফুলেই বিচরণ করে না। আবার বিচরণ যোগ্য ফুলের মধ্যে রয়েছে মৌমাছির খাদ্যের মুখ্য ও গোণ উৎস। মৌমাছি পালনের উপযুক্ত পরিবেশ নির্বাচনের পূর্বে মৌমাছির বিচরণ এলাকার বিচরণযোগ্য বৃক্ষ,শস্য ইত্যাদি সনাক্ত করতে হয়। এসব গাছপালার সংখ্যাও নিরুপণ করতে হয়। দশটি মৌ কলোনির জীবন ধারণের জন্য মৌমাছির বিচরণ এলাকায় কি পরিমান ফলনশীল মৌ-উদ্ভিদ থাকা প্রয়োজন তার একটি সাধারণ পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো। যেমন লিচু ৫/৬টি, পেয়ারা ৩০/৩২টি, জাম ৪/৫টি, কড়ই ৪/৫ টি, সাজনা ১০/১২ টি,কদম ৫/৬টি, শিমুল ২/৩টি, বাতাবীলেবু ১০/১২টি, কুল বা বড়ই১০/১২টি, লেবু ৩০/৩২টি, জলপাই ২০/২২টি, কলা ৩০০টি প্রায় ৩ একর জমির সরিষা ফসল। উল্লেখ্য এ সংখ্যার কম বেশিতে একটির পরিপূরক হিসাবে অন্যাটি কাজ করতে পারে। তবে একটি বিষয় অবশ্যই গুরুত্ব পূর্ণ যে, এলাকার মৌমাছিদের জন্য সাংবাৎসরিক খাদ্য সংস্থান আছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হয়, তদুপরি প্রয়োজনে এলাকায় বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে মৌ- উদ্ভিদের সংখ্যা পূরন করা যেতে পারে।

মৌমাছি পালনের উপযোগী পরিবেম নির্ধারণের পাশাপাশি মৌকলোনি স্থাপনের স্থান নির্বাচনেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এ স্থানটি হতে হয় ছায়াগণ ও নিরবিলি। স্থানটি যেন ভিজা স্যাঁতস্যাতে না হয় । আশে পাশে বিকট শব্দ সৃষ্টিকারী ও ধোঁয়া সৃষ্টিকারী কোন মাধ্যম থাকা চলবে না। নির্বাচিত স্থানে লোকজন, গবাদিপশু,অন্যান্য জীবজন্তু ও যানবাহনের অবাদ চলাচল নিষিদ্ধ রাখতে হয়।আশেপাশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস থাকা প্রয়োজন। মৌকলোনি স্থাপনে মৌবাক্সগুলোর মধ্যে কিছুটা দুরুত্ব রাখতে হয়। একটি মৌবাক্স থেকে অন্যাটির দূরুত্ব কমপক্ষে১৫/২০ গজ হলে ভাল হয়। মৌ কলোনির যাতায়াত পথের একবারে সম্মুখে যেন কোন গাছ বা বাঁধা সৃষ্টি কারী কিছু না থাকে। পাশাপাশি অবস্থিত মৌকলোনিগুলোর যাতায়াত রাস্তা পরস্পর বিপরীতমুখী রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

মৌখামার ব্যবস্থাপনায় মৌখামারে মৌবাক্স স্থাপনে কতগুলো বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অনেক সময় মৌখামারে স্থান সংকুলানের অভাবে মৌকলোনিগুলোকে পাশাপাশি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এভাবে মৌবাক্স স্থাপনে একটি মৌবাক্সের মৌমাছি অপর একটি মৌবাক্সের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারী মৌমাছির সাথে সংঘর্ষ হয়। একটি মৌবাক্সের মৌমাছি অপর একটি মৌবাক্সে ভুলবশত প্রবেশ করাকে

মৌমাছির ড্রিফটিং বলা হয়। অনেক সময় মৌমাছি পালনকারীদের অজ্ঞতার কারণে অধিক মাত্রায় ড্রাপটিং দেখা দেয়। কেননা তারা অনেক সময় মৌবাক্স গুলোতে একই রং ব্যবহার করে এবং এগুলোর পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে স্থাপন করে। ড্রিফটিং রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. প্রতিটি মৌবাক্সের মাঝে বেশ কিছুটা দূরুত্ব বজায় রাখা।
২. মৌবাক্সের যাতায়াত রাস্তা বিভিন্ন মুখী করে রাখা।
৩. মৌবাক্সের পাশে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা বা চিহ্নের ব্যবস্থা রাখা। যেমন- একটি মৌবাক্সে একটি গাছের পাশে এবং এর নিকটবর্তী মৌবাক্সটি একটি ঝোপঝাড়ের পাশে রাখা।
৪. মৌবাক্সে একই ধরণের রং ব্যবহার না করা। মৌবাক্সে সাধারণত নীল, হলুদ, সাদা রঙ ব্যবহার করা উত্তম। রং ব্যবহার করলে এ রঙের মৌবাক্স নীল ও হলুদ রঙের পাশে না রাখায় ভাল। কেননা নীল ও হলুদ রঙের সাথে মৌমাছি সবুজ রংকে মিলিয়ে ফেলে। মৌমাছি লাল রঙ একেবারেই বুঝতে পারে না।

মৌখামারে স্থান সংকুলানের অভাব হলে বিভিন্ন রং ব্যবহার করে এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে পাশাপাশি নিরাপদে রাখা যায়।

**মৌচাক থেকে মোম সংগ্রহ :**

দীর্ঘদিন মৌমাছি কর্তৃক ব্যবহারের ফলে মৌচাক পুরাতন ও কালো হয়ে সেগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পরিবর্তনযোগ্য এ মৌচাকগুলো থেকে সহজেই মোম প্রস্ড়ত করা যেতে পারে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ড় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মৌমাছির খামার গড়ে উঠেনি। এ কারণে মৌচাক থেকে মোম উৎপাদনের বিষয়টির ও তেমন প্রসার লাভ করেনি । ফলে এক্ষেত্রে আধুনিক কোনো প্রযুক্তির ও প্রবতর্ন হয়নি।মৌমাছি পালনে উন্নত দেশসমূহে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মোম উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন এ যন্ত্রগুলোকে মোম মেল্টার বলে আমাদের দেশের মৌমাছি পালনকারীগণ নিচের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে মোম সংগ্রহ করতে পারেন।

**ফুটন্ত পানির সাহায্যেঃ**

এটি একটি অতি সাধারণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মোম উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত মৌচাকগুলো ছোট ছোট টুকরা করে একটি পরিস্কার ও পাতলা কাপড়ে পুটলি বেধে তা ফুটন্ত পানিতে ছেড়ে দিতে হয়। ফুটন্ত পানিতে মোমের টুকরাগুলো গলে গিয়ে তরল মোম পানির সাথে মিশে এবং ময়লা আবর্জনাগুলো কাপড়ে আটকে যায়। এরপর পানিসহ পাত্রটি ঠান্ডা করলে গলিত মোম জমাট বেধে পানির উপরে ভাসমান অবস্থায় মাংশের চর্বির ন্যায় একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে। পানির উপর থেকে সহজেই এ মোম সংগ্রহ করে নেয়া যায়।

**সৌরচুল্লির সাহায্যে ঃ**

এ পদ্ধতিটি মোটামুটি একটি আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একটি সৌরচুল্লির সাহায্যে মোম সংগ্রহ করা হয়। যন্ত্রটিকে সৌরচুল্লিচালিত মেল্টার বলা হয়। এটি একটি সাধারণ যন্ত্র যা খুব সহজেই তৈরি করে নেয়া যায়। যন্ত্রটিতে একটি ধাতব পাতের তৈরি চারকোণা কক্ষ তাকে। এক্ষেত্রে স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম হলে ভাল হয়। কক্ষের উপরি অংশ খোলা থাকে তবে এ খোলা অংশটি এক টুকরা কাচ দিয়ে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কক্ষের নিচের অংশে অপসরণযোগ্য একটি তারজাল দিয়ে বন্ধ করা থাকে। কক্ষটি একটি ট্রে এর উপর স্থাপন করা হয়। এ যন্ত্রের সাহায্যে মোম সংগ্রহের জন্য মৌচাকের টুকরাগুলো তারজালের উপর রেখে কক্ষের মুখটি কাচের ঢাকনা দিয়ে ভালভাবে আবদ্ধ করতে হয়। এরপর যন্ত্রটিকে এমন স্থানে রাখতে হয় যেন সূর্যের কড়া তাপ সরাসারি কাচের উপরে পড়ে। সূর্যের তাপ কাচের ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে তারজালের উপরে রাখা মৌচাকগুলোকে গলাতে থাকে । গলিত মোম যন্ত্রের নিচে রাখা ট্রেতে জমা হতে থাকে। এরপর সবটুকু মোম গলে ট্রেতে পড়ার পর টেটি ঠান্ডা স্থানে রেখে দিতে হয়। তরল মোম ধীরে ধীরে জমাট বাধার ট্রে থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

## সেসন ঃ ৪

- মৌচাক তৈরী
- মৌমাছির খাদ্য
- **মৌকলোনি স্থানান্তর**

## মৌচাক ঃ

মৌচাক (Honey comb) হচ্ছে লক্ষ লক্ষ ষড়ভূজ আকৃতির কুঠরি সম্বলিত মোম দিয়ে তৈরি মৌমাছিদের বাসা। মৌচাকের উভয় পাশেই একুঠরি রয়েছে। উভয় পাশের কুঠরির মাঝে থাকে একটি প্রাচীর যা একই সাথে উভয় দিকের কুঠরির বিভাজক ও কুঠরির মেঝে হিসাবে কাজ করে। ষড়ভূজ আকৃতির প্রতিটি কুঠরির ছয়টি দেয়ারেই অন্য কুঠরির দেয়াল হিসাবে কাজ করে। কুঠরিগুলো ষড়ভূজাকার হওয়ায় অল্প পরিশ্রমে ও কম মোম ব্যবহার করে বেশী জায়গা আটকানো যায়। মৌমাছিদের নিপুণতার স্বাক্ষর এ মৌচাকের সৌন্দর্য , উপযোগীতা ,নির্মান কাঠামো সত্যিকার অর্থে একটি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক নিদর্শন।

ছবি ঃ গাছে তৈরী মৌচাক

আধূনিক কালের স্থপতিগণও মৌচাকের নির্মান কৌশল দেখে বিস্মিত হয়ে যান। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে মৌমাছিদের এ মৌচাক তৈরি করে একটি নিদিষ্ট বয়সের শ্রমিক মৌমাছি। মৌচাক এবং মোম নিয়ে কৌতূহলী শত শত বছর পূর্বে থেকেই। ১৬৮৪ সারে জন মার্টিন সূচের অগ্রভাগ দিয়ে মৌচাক নির্মানকারী একটি মৌমাছির উদর থেকে মোমের কুচি সরিয়ে ফেরতে সক্ষম হন এবং তিনিই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, মোম হচ্ছে শ্রমিক মৌমাছির একটি জৈবিক প্রক্রিয়াজাত পদার্থ। এরপর ১৭৯২ সালে জন হান্টার ব্যক্ত করেন যে, মৌমাছির মোম গ্রন্থি থেকেই মোম উৎপত্তি হয়।

শ্রমিক মৌমাছি উদরের শেষ চারটি খন্ডয়িত অংশে অবস্থিত চার জোরা মোম গ্রন্থি থাকে। সাধারণত ১১ দিন বয়সকালে এ মোম গ্রন্তি গুরো পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং এ সময়ে এরা মোম উৎপাদনে সক্ষম হয়। ১৬ দিন বয়সের পর মোম গ্রন্থি গুলোর কার্য ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে এবং শেষাবদি গুলো নিষ্ক্রিয়ের পর্যায়ে উপনীত হয়।

মোম উৎপাদক মৌমাছির মোম উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমানে মধু খেতে হয়। মধুর শর্করা স্নেহ জাতয়ি পর্দাথ মোমে রূপ নেয়। ১ কিলোগ্রাম মোম উৎপাদনের জন্য মোম উৎপাদক মৌমাছিদের ৬ থেকে ১৫ কিলোগ্রাম মধু খেতে হয়। মোম উৎপাদনে মধুর পাশাপাশি এদের কে পরাগও খেতে হয়। পরাগ হচ্ছে মৌমাছিদের জন্য একমাত্র আমিষ জাতীয় খাদ্য। নির্দিষ্ট বয়সের শ্রমিক মৌমাছিরা প্রয়োজনীয় পরিমান মধু ও পরাগ খেয়ে চাক তৈরির স্থানে নিরবে জটলা পাকিয়ে ঝুলে থেকে মোম উৎপাদন উপযোগী তাপ সৃষ্টি করে। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর ৯০ থেকে ৯৫ ফারেনহাইট তাপে (মোম উৎপাদন উপযোগী তাপমাত্রা) মৌমাছির মোম গ্রন্থি থেকে মোমের অতি সুক্ষ কুচি বের হতে থাকে। এ কুচি গুলো এতই সুক্ষ যে, এর ১০১০ টির ওজন মাত্র ২৩৫ মিলি গ্রাম অথ্যাৎ ১ কিলোগ্রাম মোমে প্রায় ৪০ লক্ষ কুচি থাকে। মোম গ্রন্থি থেকে বের হয়ে আসা এসব সূক্ষ্র কুচিগুলো দিয়েই মৌমাছি মৌকুঠরি তৈরি করে। মোম গ্রন্থি থেকে মোম নিঃসৃত হওয়ার করার পর এগুলো ব্যবহারর পূর্বে এরা তাদের শিরঃগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এক ধরনের ক্ষরন মিশিয়ে মোমকে মসৃন করে। মৌকুঠরি গুলোতে মৌমাছির ডিম,শূককীট, মূককীট,তথা মৌমাছিদের জন্ম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং মধুও শাবক খাদ্য সঞ্চয় করে। মৌকুঠরিতে কোষবদ্ধ অবস্থায় রাণী,পুরুস ও শ্রমিক মৌমাছির মূককীট

বেশ লক্ষণীয়। ১৫০ গ্রাম ওজনের একটি মৌচাকে ৯০০০ এর বেশি মৌকুঠরি থাকে যেখানে মৌমাছিরা ৪ কিলোগ্রাম মধু সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

ছবি ঃ মৌমাছি পালনের জন্য তৈরী মৌ বক্স

সাধারণ দৃষ্টিতে মৌচাকের সব মৌকুঠরির আকার সমান দেখা গেলেও বস্তুত তা ঠিক নয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে,মৌচাকে প্রধানত দুটি ভিন্ন পরিনমাপের কুঠরি রয়েছে। মধূ পরাগ ইত্যাদি সঞ্চয় করে রাখার জন্য কোন নিদিষ্ট মাফের কুঠরির প্রয়োজন নেই, তবে শ্রমিক মৌমাছি ও পুরুষ মেওমাছি জন্ম নেয়ার জন্রপ্রয়োজন দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ সম্পন্ন পৃথক পৃথক কুঠরির। শ্রমিক মৌমাছি জন্ম নেযার কুঠরিগুলো তুলনামূলক ভাবে আকারে ছোট। এ কুঠরি বা কোষগুলো কে শ্রমিক কোষ বলে। প্রজাতি ভেদে যেমন মৌমাছিদের আকারে ভিন্নতা রয়েছে ঠিক তেমনি প্রজাতি ভেদে মৌচাকের মৌকুঠরিগুলোর পরিমাপেও ভিন্নতা রয়েছে। এখানে *Apis mellifera* প্রজাতির মৌমাছির কুঠরির একটি পরিমান উল্লেখ করা হলো। এ প্রজাতির শ্রমিক কোষ গুলো প্রতিটির ব্যাস ৫মিমি, এবং পুরুষ কোষের ব্যাস ৬.৫ মিমি। প্রতিটি পুরুষ কোষ তৈরিতে ৩০ মিলিগ্রাম মোম অর্থাৎ প্রায ৫০টি মোমের কুচি প্রয়োজন হয়। মৌকলোনিতে শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছির কুঠরি ব্যাতীত ভিন্ন পরিমান ও ভিন্ন আকৃতির আরও এক জাতীয় কুঠরির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ বিশেষ আকৃতির কুঠরি থেকে রাণী মৌমাছির জন্ম হয়এবং এগুলোকে রাণী কুঠরি বা রাণী কোষ বলা হয়। *Apis cerana* প্রজাতির রাণী কোষ ষড়ভূজ আকারের নয়। এগুলো লম্বা এবং গোলাকার ধরনের। *Apis mellifera* প্রজাতির রাণী কোষ গুলো লম্বায় সাধারণত ২৫ মিমি.। রাণী কোষের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এগুলো সচরাচর মৌচাকের প্রান্তদেশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে রাণী কোষ মৌচাকের মধ্যকোষে ও নির্মিত হতে পারে। রাণী কোষের পশ্চাৎভাগ তুলনামূলকভাবে সম্মুখ অংশের চেয়ে মোটা এবং দেখতে বাদামী রংয়ের। রাণী কোষের মুখ কোষের নীচের অংশে থাকে। মৌচাকে শ্রমিক মৌমাছির কোষ ও পুরুষ মৌমাছির কোষ দেখতে অনেকটা ষড়ভূজাকার।

**মৌমাছির খাদ্যঃ**

মৌমাছি একটি অতি পরিশ্রমী প্রাণী । ফরে কেবর বেঁচে থাকার তাগিদেই নয়, অধিক শ্রমের জন্য ও এদের প্রয়োজন পুষ্টি সম্পূর্ন খাদ্য। মৌমাছির প্রধঅন খাদ্য হচ্ছে মধু ও পরাগ। অবশ্র ইতি পূর্বেই জানা গেছে যে,বিবর্তনবাদের ইতিহাস অনুযায়ী মধুও পরাগ মৌমাছিদেরপূর্ব পরুষের আদি খাদ্য ছিল না।বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে মৌমাছির উৎপত্তি হয়েছে এক শ্রেণীর মাংসাশি বোলতা থেকে । এ বোলতা গুলো প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভাবে মাংসাশী থাকরে ও ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মাংসের পাশাপাশি নিরামেষভোজীতে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। কালক্রমে বিবর্তনের বিভিন্ন স্থর অতিক্রম করে এক পর্যায়ে এর া খাদ্যভাস পরিবর্তন করেসম্পূর্ণ রূপে মধ ু ও পরাগে নির্ভরশীল হয়। অতিশ্রমশীরতার জন্য মৌমাছির দেহে প্রতিনিয়তই শর্করা জাতীয় খাদ্য মজুদ রাখতে হয়। মধু একটি উচ্চমান সম্পূর্ণ শর্করা জাতীয় খাদ্যঅ এ খাদ্যই মৌমাছির শক্তির প্রধান উৎস।

এছাড়াও মধুতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকারর চিনি মৌমাছিদের বেচেঁ থাকার জন্য এবং শ্রমের জন্য অপরিহার্য। মৌমাছিদের দেহে গড়ে শতকরা ২ভাগ চিনি রয়েছে। মাঠে কার্যরত শ্রমিক মৌমাছিদের রক্তে চিনির এ শতকরা হার ২.৬ থেকে ৪.৫ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। রক্তে প্রয়োজনীয় চিনির পরিমান হ্রাস পেলে মৌমাছির জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি

হয়। শ্রমিক মৌমাছিদের দেহে দেহে যদি চিনির পরিমান হ্রাস পেয়ে শতকরা ১.০ ভাগ হয় তবে তারা উড়তে অক্ষম হযে পড়ে। পুরুষ মৌমাছির রক্তে বিদ্যামান চিনির শতকরা হার ১.২।

রাণী মৌমাছির ক্ষেত্রে রক্তে চিনির পরিমান নির্ভর করে বয়সের উপর। সদ্য প্রসূত রাণীর রক্তে চিনির শতকরা হার ১.৭, মিলন উপযোগী বয়সে ১.৩ এবং মিলন শেষে ডিম প্রসবকালে তা হ্রাস পেয়ে এর শতকরা হার হয় ০.৩ ভাগ। অপর দিকে প্রজনন ও মধু ঋতুতে আবার রাণী মৌমাছির রক্তে চিনির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা হার ১.৫ ভাগে। মৌমাছির দেহ থেকে প্রতিনিয়ত চিনি ক্ষয় হচ্ছে। ক্ষয়িত এ চিনির পরিমান মূলত নির্ভর করে শ্রমের প্রকৃতি ও তাপমাত্রর উপর। যেমন উড়ন্ত অবস্থায প্রতি ঘণ্টায় একটি শ্রমিক মৌমাছির দেহে ১০ মিলিগ্রাম এবং পুরুষ মৌমাছির ক্ষেত্রে ৩০ মিলিগ্রাম চিনি ব্যয় হয। মৌকলোনিতে অবস্থান কালে ৫০ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় বসা অবস্থায় ১০ মিলিগ্রাম , ৯৮ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ০.৭ মিলিগ্রাম, ১১৮ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ১.৪ গ্রাম চিনি ব্যয হয়।তবে বয়স ও লিঙ্গ ভেদে এর কিছুটা তারতাম্য হয়।

মৌমাছির অপর একটি প্রধান খাদ্য হচ্ছে পরাগ ও ফুরের রেণু । ফুলের পরাগ হচ্ছে একটি আমিস জাতযি খাদ্য। রাণী ও পুরুষ মৌমাছি খাদ্য হিসাবে আমিষ গ্রহণ করে না।পরাগ শ্রমিক মৌমাছির খাদ্য । তবে পূর্ণ বয়স্ক শ্রমিক মৌমাছিরা সাধারণত পরাগ খায় না।পরাগ মূলত শূককীট পর্যায়ের এবং সেবিকা ও গৃহবাসী মৌমাছির খাদ্য তবে মোম উৎপাদক শ্রমিক মৌমাছিদের ও পরাগ একটি গুরুত্ব পূর্ণ খাদ্য। পরাগ অর্থ্যৎ এ আমিষ জাতীয় খাদ্য টি মৌমীছর দৈহিক কাঠামোর বিভিন্ন পেশী গ্রন্থি সমূহের গঠন কাজে বিশেষ প্রয়োজন। বিবিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, একটি মৌমছির ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় রুপান্তর পর্যন্ত প্রায ১৫০ মিলিগ্রাম পরাগ প্রয়োজন।একটি শক্তি শালী মৌকলোনির বাৎসরিক প্রায় ২০ থেকে ৩০ কিলোগ্রাম পরাগ প্রয়োজন হয়। পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক মৌমাছি মৌকুঠরি তেকে বের হয়ে আসার দ ঘণ্টা পর তেকে পরাগ খেতে শুরু করে। সাদারণত ৫ থেকে ৭ দিন বয়সের পর থেকে এ পরাগ গ্রহণের পরিমান ক্রমান্বয়েই কমতে থাকে। মৌমাছি পারগ থেকে যে শুধু আমিষ জাতীয় খাদ্যই পেয়ে থাকে তা নয় , তাদের দেহের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় স্নেহ জাতযি খাদ্য উপাদান সহ ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদিও এ পরাগ থেকে সংগ্রহ করে।

**মৌকলোনি স্থানান্তর ঃ**

কোন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মৌকলোনি নিয়ে যাওয়াকে মৌকলোনি নিয়ে যাওয়াকে মৌকলোনি স্থানান্তর বলে। মৌকলোনি স্থানান্তরের নির্দিষ্ট কোন ঋতু নেই। প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে বছরের যে কোন সময় এ স্থানান্তর হতে পারে। নানাবিধ কারণে মৌকলোনি স্থানান্তর করা হয় বা স্থানান্তরের প্রয়োজনীতা সৃষ্টি হয়। তবে যে সব প্রধান প্রধান কারণে মূলত মৌকলোনি স্থানান্তর করা হয় সেগুলো উল্লেখ করা হলো।-

১. নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট এলাকার মিশ্র অথবা একক ফুলের মধু সংগ্রহের জন্য।
২. নির্দিষ্ট এলাকার মৌখাদ্যের উৎসের প্রাচুর্যতায় অতিরিক্ত মধূ সংগ্রহের জন্য।
৩. কোন নির্দিষ্ট এলাকার পরাগ সংযোজনের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও এগুলোর গুণগত মান উন্নয়নের জন্য।
৪. দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা/ আবহাওয়া থেকে মৌকলোনিকে রক্ষা করার জন্য।
৫. খাদ্য সংকট কালে মৌকলোনিকে রক্ষা করার জন্য।
৬. দুর্বল মৌকলোনিকে শক্তিশালী মৌকলোনিতে রূপান্তরিত করার জন্য।

মৌকলোনি স্থানান্তর যে উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে হোক না কেন, স্থানান্তরে অবশ্যই পদ্ধতি অনুসরণ করে করতে হয়।অন্যথায় মৌকলোনি ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। স্তানান্তরের পূর্বে,স্থানান্তর কালীন অবস্তায় এবং স্তানান্তর পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু নিয়মাবলী অবলম্বন করা প্রয়োজন; যেমন-

১. মধুঘরে নিষ্কাষণযোগ্য মধূ থাকলে মৌকলোনি স্থানান্তরের পূর্বে তা নিষ্কাষণ করতে হয়। নচেৎ মধুপূর্ণ মৌচাকগুলো পরিবহণকালে ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

২. বাচ্চাঘর বা মধুঘরে শূণ্য ফ্রেম থাকলে তা অপসারণ করতে হয়। এবং সমস্ত ফ্রেম কক্ষের এক পাশে টেনে এনে শেষ প্রান্তের ছোট তারকাটার সাহায্যে (১" পরিমাপের) এমন ভাবে আটকিয়ে দিতে হয় যেন পরিবহণকালে ফ্রেমগুলো নড়াছড়া করতে না পারে।

৩. স্থানান্তরের পূর্বে মৌবাক্সের ভিতরে কৃত্রিম খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

৪. স্থানান্তরের পূর্বে সন্ধ্যায় যখন সব মৌমাছি মৌবাক্সে প্রবেশ করে তখন মৌমাছির যাতায়াত পথ ভালভাবে বন্ধ করতে হয়।

৫. স্থানান্তরের পূর্বে মৌবাক্সের প্রধান ঢাকনা নামিয়ে রেখে মৌবাক্সের অবশিষ্ট সব অংশ একত্রে মজমুত করে বেঁধে ফেলতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন মৌবাক্সের কোন অংশ দিয়ে মৌমাছির বের হওয়ার সুযোগ না থাকে।

৬. মৌকলোনি স্থানান্তরের জন্য রাত হচ্ছে উত্তম সময়। কেননা রাত মেওমাছিরা সহজে উত্তেজিত হয় না। তবে রাতে স্থানান্তর সম্ভব না হলে রাতে মৌবাক্সের যাতায়াত রাস্তা বন্ধ করে রেখে পরদিন যথাসম্ভব শীঘ্র স্থানান্তর করতে হয়।

৭. গন্তব্য স্থানের দূরুত্ব অধিক না হলে এবং মৌকলোনি সংখ্যা অধিক না হলে মৌকলোনি মাথায় বা কাঁধে করে বহন করাই উত্তম।

৮. দূরবর্তী স্তান এবং অদিক সংখ্যাক মৌকলোনির ক্ষেত্রে নৌকা , রিক্সা ্ ভ্যানর ,রেল বা ট্রাকযোগে পরিবহন করা হয়। তবে নদী এবং রেলপথে পরিবহণ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও কম ঝুকিপূর্ণ।

৯. যানবাহনে বিশেষ করে ট্রাক ও রেলপথে পরিবহণ কালে মৌবাক্স নরম জাতীয় কিছুর উপর ( যেমন মোটা চট,খড় ইত্যাদি) সম্মুখমুখী করে স্তাপন করতে হয়। কেননা এতে মৌবাক্সের ফ্রেমগুলো লম্বালম্বিভাবে অবস্তান করায় যানবাহনের ঝাকুনিতে মৌচাক ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা রোধ করা যায়।

১০. যানবাহনের গতি সাধারণত ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটারের উধ্বে না হওয়া উত্তম।

১১. গন্তব্যস্থানে পোঁছার পর নির্ধারিত স্থানে মেওকলোনিগুলো স্থাপন করতে হয়।

১২. নির্ধারিত স্থানে মৌবাক্স স্থাপন করে মৌমাছিদের শান্ত হবার জন্য কিছুসময় অপেক্ষা করে পর্যায়্রমে মৌমাছিদের যাতায়াত পথ খুলে দিযে যাতায়াত পথে রাণী দরজা স্থাপন করতে হয।

১৩. পরবর্তী দিন মৌবাক্সোর পাটাতন গুলো পরিষ্কার করতে হয়এবং মৌমাছিদের আচরণ পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়।

১৪. পরবর্তী কয়েকদিন পর অর্থাৎ মৌমাছিদের আচরণ সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হরে রাণী দরজা অপসারণ করে ফেলতে হয়। এখানে মৌমীছদের সন্তোষজনক আচরণ বলতে মৌমাছিদের মাঠে যাতায়াতের হার, পরাগ ও নেকটার সংগ্রহের হার বোঝনো হয়েছে।

১৫. অতঃপর নিয়মিত ভঅবে রুটিন অনুযায়ী পরিচর্যা ও ঋতুভিত্তিক অব্যাহত রাখতে হয়।

# সেসন ঃ ৫

- ফুলের পরাগায়ন
- **মৌমাছি ও পরাগায়নঃ**
- ফুলের পরাগায়নে মৌমাছির ভূমিকা

**পায়ে পরাগ বহনরত মৌমাছি**

**ফুলের পরাগায়ন ঃ**

ফুলের প্রতিটি উর্বর পুংকেশরের মাথায় একটি পরাগধানী থাকে। পরাগধানীর ভিতরে পরাগরেণু থাকে। পংকেশর পরিণত হলে পরাগধানী ফেটে যায়এবং পরাগরেণু বিভিন্ন মাধ্যম বা বাহকের সাহায্যে স্ত্রী কেশরের গর্ভমুন্ডের সংস্পর্শে আসে। পরাগধানী থেকে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে একই প্রজাতির ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরাগায়ন বলে। পরাগায়নের পর পরাগের পুংজনন কোষ এবং ডিম্বকের স্ত্রী জনন কোষ মিলিত হয়। এ মিলন কে নিষক বলে। নিষিক্ত করণের মাধ্যমে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার ফুলের ডিম্বাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। সুতরাং ফুল থেকে ফল  ও বীজের জন্ম হয়ে উদ্ভিদের বংশ রক্ষার  ক্ষেত্রে পরাগায়ন অথ্যাবশ্যকয়ি ভূমিকা পালন করে থাকে। পরাগায়নের উপর ভিত্তি করে পরাগায়ন কে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে।  যেমন স্ব- পরাগায়ন এবং পর- পরাগায়ন পরাগায়ন প্রক্রিয়াটি যখন একই ফুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে স্ব- পরাগায়ন বলে অর্থাৎ স্ব- পরাগায়ন ফুলের উভলিঙ্গতা একটি অন্যতম পূর্বশর্ত।

অপর দিকে পরাগরেণু যখন সে গাছের অন্যফুলে বা একই প্রজাতির অন্য গাছের ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হয় তখন তাকে পর পরাগায়ন বলে। উদ্ভিদ জগতে অধিকাংশ ফুলেরই পর পরাগাযন সংগঠিত হয। শুধু তাই নয পরাগায়ন নিশ্চিত করণের জন্য প্রকৃতিগতভাবেই অনেক ফুলে রয়েছে বিভিন্ন কলাকৌশল।উদাহরণ স্বরুপ পেঁপে, কুমড়া, কাঁকরোল, তামাক ইত্যাদি ফুলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব ফুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য একলিঙ্গতা।এখানে যেহেতুফুরৈর পুংকেশর ও গর্ভকেশর পৃথক পৃথক ফুলে বিদ্যামান থাকে ,সেজন্য এসব ফুলে পরাগায়ন অবশ্যম্ভাবী। এর পর তামাক ফুলের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ফুলে রয়েছে স্ব- বন্ধ্যাত্বতা। ফলে তামাক ফুল উভলিঙ্গ হওয়া সত্বে ও অর্থাৎ একই ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক থাকা সত্ত্বেও যদি একই ফুলের পরাগরেণু সেই ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হয় তবুও গর্ভধান ঘটে না। আবার ফুলের বিষম - পরিণতি বৈশিষ্ট্য পরাগায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফুলের এ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উভলিঙ্গ ফুলে পংকেশর ও স্ত্রীকেশর একই সময়ে পরিপুষ্ট হয় না। যেমন সুর্যমূখী ফুল- এক্ষেত্রে ফুলের পুংকেশর স্ত্রীকেশরের আগেই পরিপুষ্ট হয়।আবার বেগুনের ফুলের ক্ষেত্রে গর্ভকেশরেই আগে পরিপুষ্ট হয়। ফলে এ জাতীয় ফুল গুলোতে অর্থ্যৎ  বিষম - পরিণতি  বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ফুলে স্ব -পরাগায়ন সম্ভব হয় না। এরপর সরিষা, বাতাবী লেবু ফুলের নাম উল্লেখ করা যায়। এ ফুল গুলো উভলিঙ্গ হলেও স্ব- সঙ্গমরোধী  হবার কারণে অথ্যৎ এসব ফুলের গর্ভমুন্ড পরাগধানীর অনেক উপরে অবস্থান করায় এবং জামরুল ,কামরাঙ্গায় অসমগর্ভদন্ডের  কারণে স্ব - পরাগায়ন সম্ভব হয় না।

পরাগায়ন যে প্রকারেই হোক না কেন ,যেহেতু পরাগরেণুর নিজেস্ব কোন চলন শক্তি নেই সেহেতু পরাগরেণু কে স্থানান্তরিত হতে হয় বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে। এ বাহক গুলো হচ্ছে বায়ু, পানি, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে

পরাগায়নের বাহকের উপর ভিত্তি করেও ফুলের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। যেমন যেসব ফুলের পরাগায়ন বায়ুর সাহায্যে হয় সেগুলোকে বায়ুপরাগী ফুল বলা হয়।একইভাবে পরাগায়ন পানির সাহায্যে হলে পানিপরাগী, প্রাণির সাহায্যে হলে প্রানিপরাগী, পতঙ্গের সাহায্যে হলে পতঙ্গপরাগী ফুল বলে। প্রাণি পরাগী ফুলের মধ্যে ও আবার পাখি পরাগী এবং বাদুরপরাগী ফুল রয়েছে।

মৌমাছি ও পরাগায়ন ঃ
প্রকৃতিতে মৌমাছি এবং ফুলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । কেননা মৌমাছির জীবন ফুল নির্ভর। অপরদিকে উদ্ভিদ কে বংশ রক্ষা ও বিস্তারে বহুলাংশে মৌমাছির উপর নির্ভরশীল হতে হয়।আর এ কারণেই বৃক্ষরাজি তার ফুলের পাপড়িতে বিভিন্ন রঙের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে পরাগায়নের জন্য মৌমাছিদের আকর্ষন করে থাকে।

পরাগায়নে মৌমাছির ভূমিকা ঃ

**ছবি ঃ সরিষা ক্ষেতে স্থাপন করা মৌ বক্স**

পরাগায়নের বাহকগুলো নিয়ে যদি পর্যালোচনা করা যায় তবে দেখা যায় যে.বায়ু ও পানি এ দুটি মাধ্যমেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।এছাড়াও এখানে সঠিক পরাগায়নের নিশ্চয়তা তুরনামুলকভাবে কম। প্রাণির মাধ্যমে সংগঠিত পরাগায়নের বিস্তৃতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।তবে বাদুর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বাহক। কেননা, নিশাচর এ প্রাণিটি রাতে প্রস্ফুটিত ফুলের পরাগায়নে সাহায্যে করে। জানা যায় উদ্ভিদ জগতে পরাগায়নের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পরাগায়নেই সংগঠিত হয় কীটপতঙ্গের মাধ্যমে।
কীটপতঙ্গের সাহায্যে সংগঠিত পরাগায়নের সিংহভাগই সংগঠিত হয় মৌমাছি নামক পতঙ্গটি দিয়ে। শুধু তাই নয়মৌমাছির সাহায্যে সংগঠিত পরাগায়ন বহুদিন থেকেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কেননা প্রথমত মৌমাছির তার খাদ্য সংগ্রহের জন্র অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচরণ করে।দ্বিতীয়ত,অন্যান্য যেকোন কীটপতঙ্গ এর তুলনায় মৌমাছি অধিক সংখ্যাক প্রজাতির ফুলে বিচরন করে। তৃতীয়ত ,বিচরণকালে বিচরণকৃত ফুলের সংখ্যাও অনেক বেশি, কেননা একটি মৌমাছি যখন তার খাদ্র সংগ্রহের জন্য বের হলে প্রতিবার কযেক হাজার ফুলে বিচরন করে। তবে পরাগায়নের স্ক্রেত্রে মৌমাছির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিচরণের ক্ষেত্রে এরা কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করে যা সাধারণত অন্যান্য কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ সাজনা মাঘ থেকে ফাল্গুন মাসে যখন প্রকৃতিতে মূলা, মিমুল ইত্যাদি ফুল থাকে তখন তারা যদি সাজনা ফুল থেকে নেকটার সংগ্রহ শুরু করে , তবে এ উৎস শেষ না হওয়া পর্যন্ত সচরাচর অন্য কোন ফুলে যায় না। আর এ কারণেই এ প্রজাতির মৌমাছির মৌকলোনি থেকে একপুষ্পক মধু পাওয়া যায়। একই প্রজাতির ফুলে বিচরণের এ বৈশিষ্ট্যর ফলে এদের সাহায্যে সংগঠিত পরাগায়ন দ্রুত ও সঠিক হয়। আর সঠিক পরাগায়নের অর্থই হচ্ছে ফসলের গুণ ,মান ও পরিমান বৃদ্ধি। এছাড়াও পরাগায়নে মৌমাছির আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ,এদের সাং বাৎসারিক কর্ম ক্ষমতা,যেমন শীতকালে যখন প্রকৃতিতে অন্যান্য কীটপতঙ্গ দেখা যায় না তখনও মৌমাছিরা মৌকলোনিতে জটলা পাকিয়ে তাপ উৎপাদন করে মৌকলোনিকে টিকিয়ে রেখে খাদ্য আহরনের জন্য ফুলে ফুলে বিচরন করে। এভাবেই মৌমাছিরা বছরব্যাপীয় পরাগায়নে সহায়তা করে। উপরন্ত মৌমাছির দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরাগায়নের জন্য অধিক সহায়ক বা উপযোগী।কেননা মৌমাছির দেহাবয়ব আবৃত থাকে ছোট ছোট অসংখ্যা লোমে। এরা যখন খাদ্য সংগহের জন্য ফুলে ফুলে বিচরন করে তখন ফুলের লক্ষ লক্ষ পরাগরেণু মৌমাছির দেহের লোমে জড়িয়ে যায়, ফলে পরাগরেণু অতি সহজেই এবং অতি দ্রূত ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরিত হয়।

মৌমাছি কৃর্তক পরাগায়নের প্রক্রিয়াটি প্রধানত পর পরাগায়ন প্রকৃতির। কৃষিবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী পরাগায়নের ক্ষেত্রে পর পরাগায়নেই উৎকৃষ্ট । কেননা এ পদ্দতির উৎপন্ন বীজ বা বংশধর অধিক জীবনীশক্তি সর্ম্পন্ন ও অধিক সহণশীল হয়। পর পরাগায়নের মাধ্যমে উৎপন্ন বীজ পুষ্ট হওয়ায় এ বীজের অঙ্কুরোধগম বা বীজায়নের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। এ ছাড়াও পরন পরাগায়নে নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণের সম্ভাবণা রয়েছে। তাই পর পরাগায়নে উন্নত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে সহায়ক। সুতরাং মৌমাছির সাহায্যে পরাগায়নের বিস্তৃতি,কার্যকারিতা,এবং বৈশিষ্ট্য বিচার- বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, পরাগায়নে মৌমাছি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এ কারণেই কৃষি ক্ষেত্রে মৌমাছির গুরুত্ব আজ সমগ্র বিশ্বে সুপ্রতিষ্টিত। বিভিন্ন দেশ আজকাল ফসলের উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য মৌমাছির সাহায্যে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে কৃষি ক্ষেত্রে মৌমাছির ভুমিকাকে অগ্রগণ্য হিসাবে বিবেচিত করা হয় এবং মৌকলোনি থেকে প্রাপ্ত মধু ও অন্যান্য সাম্রগ্রি কে উপজাত হিসাবে গণ্য করা হযে থাকে। এসব দেশে ফসলের ফুল ফোটাকালে পরাগায়নে সহায়তার জন্য কৃষি জমিতে বা এর আশেপাশে সাময়িক সময়ের জন্য মৌকলোনি স্থাপন করা হয়। এতে একদিকে যেমন ফসলের উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায় াপরদিকে মৌপালনকারীদের অধিক পরিমান মধু আহরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মৌমাছি পালন করা হয় এমন এলাকায় গড়ে প্রতিবছর যে মূল্যের মধু ও মোম উৎপাদিত হয় একই সময়ে সে এলাকার মৌমাছির সাহায্যে সংগঠিত পরাগায়নের মাধ্যমে বাড়তি ফসলের মূল্য দাড়ায় মধু ও মোমের মূল্যের প্রায় ১০ থেকে ১৫ গুণ।

কৃষি বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী সরিষা ফুলে মৌমাছির সাহায্যে পরাগায়ন ঘটিয়ে ফসলের ফলন স্বাভাবিকের চেয়ে দেড় থেকে দুই গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়াও মৌমাছি দিয়ে পরাগায়নে অনেক ফসলেরই উৎপাদন ১০ থেকে ৩০০ গুণ বৃদ্ধি পায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, মৌমাছি সূর্যমূখী ফুলে সক্রিয় থাকলে এর উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়।
কৃষিক্ষেত্রে মৌমাছির গুরুত্বপুর্ণ অবদানের পাশাপাশি একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজনযে, অনেক সময় ফসলের মাঠে কীট নিয়ন্দ্রন রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে কীটনাশকের যত্রতত্র ব্যবহার করা হলে মৌমাছিসহ অনেক উপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণে ক্ষেতে উপকারী পোকার উপস্থিতি লক্ষ্য করে প্রয়োজন বোধে কীটনাশক প্রয়োগ কিংবা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার সাহায্যে কীট নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কীটনাশকের বিষাক্ততার ক্ষেত্রে বেশ তারতাম্য লক্ষ্য করা যায়।

## সেসন ঃ ৬

### মৌ মাছির শত্রু এবং এর প্রতিরোধ ঃ

**পিপড়াঃ**

পিপড়া বিশেষত কালো পিপড়া মৌমাছিদের একটি অন্যতম শত্রু । শক্তিশালী মৌকলোনিতে পিপড়া আক্রমন করে যথেষ্ট সফল হতে না পারলে ও দুর্বল মৌকলোনিতে এরা অতি সহজেই আক্রমণ করে মৌচাকের মধু, পরাগ, ডিম, শুককীট ও মূককীট খেয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলে এরা পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিকে ও আক্রমণ করে। প্রাকৃতিক নতুন মৌকলোনি মৌবাক্সে স্থাপনের পর পিপড়ার আক্রমনেরন আশস্খা অধিক থাকে । নতুন কলোনি মৌবাক্সে স্থাপনের পর প্রথম ২/১ দিন মৌমাছিরা সাধারণত স্বাভাবিক কাজকর্ম করে না এবং এ সুযোগেই পিপড়া মৌকলোনিতে আক্রমন করে। পিপড়ার আক্রমনের কারনে মৌমাছি মৌবাক্স ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া ও অনেক সময় পিপড়া মৌবাক্সের শুক ও উষ্ণ স্থানসমূহে বাসা বাধে । পিপড়ার আক্রমণ রোধে মৌবাক্সের স্ট্যান্ডের নিচে পানি ভর্তি পাত্র অর্থাৎ জলকান্দা স্থঅপন এবং নিয়মিত পানি পরিবর্তন ও পরিস্কার রাখতে হয়। কীটনাশক বা অন্য কোনো প্রকার রাসায়নিক সামগ্রী প্রয়োগের মাধ্যমে মৌবাক্সের ভিতরের পিপড়া দমন করা উচিত নয়। কেননা ওষুধ প্রয়োগের পর পিপড়া এলোমেলোভাবে মৌচাকে চলাচল করার সময়ে এগুলোর মাধ্যমে মধু দুষিত হয়ে যাবার আশঙ্কা থঅকে । মৌকলোনিতে পিপড়ার আক্রমনের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি হলে অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য পুরান কাপড় পোড়া মবিলে

ভিজিয়ে মৌবাক্সের ষ্ট্যান্ডের সাথে জড়িয়ে রাখলে পিপড়া মৌবাক্সে উঠতে পারে না। অনেকসময় মৌবাক্সের আশেপাশে মাটির গর্তে পিপড়া বাসা বাধে। এসব বাসা কেরোসিন তেল, পানি মিশ্রিত গ্যামাক্সিন, অলড্রিন ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে ধ্বংস করে ফেলতে হয়।

**বোলতাঃ**

বোলতা বেশ কয়েক প্রজাতির রয়েছে। এগুলো সাধারণত গাচের ডালে, গাছের গর্তে ও মাটির গর্তে বাসা বাধে। মৌমাঝিছ যখন ফুলে ফুলে বিচরণ করে তখন মৌমাছিকে আক্রমন করে। এ চাড়া ও বোলতা নেকসময় মৌবাক্সের আশেপাশে বোলতা বাসা বাধে ও মৌবাক্সের কাছেই বিচরণ করতে থাকে এবং সুযোগ বুঝে মৌবাক্সে যাতায়াতকারী মৌমাছিদের আক্রমণ করে। দুর্বল মৌকলোনির সন্ধান পেলে এরা অনেকসময় এককভাবে বা দলবদ্ধ হয়ে মৌবাক্সের ভিতরে প্রবেশ করে ও আক্রমণ করে। বোলতার আক্রমণ প্রতিহত করার জণ্য বোলতার বাসা ধ্বাংস করে ফেলতে হয় এবং তা করতে হয় রাতে । উল্লেখ্য বোলতা উপদ্রত এলাকায় মৌমাছিরা মৌবাক্স থেকে বের হতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে।

**মাকড়সাঃ**

মাকড়সা মৌমাছির একটি উল্লোখযোগ্য শত্রু। মৌমাছি খায় এমন বেশ কয়েক প্রকারের মাকড়সা রয়েছে। এগুলো মৌবাক্সের আশেপামে জাল বিস্তার করে বসে থাকে । মৌমাছি আসা- যাওয়অর পথে যখন জালে আটকে যায় তখন মাকড়সা মৌমাছিদের মেরে ফেলে এবং এদের দেহের রস চুষে খায়। অনেকসময় বিশেষ করে দুর্বল মৌকলোনির ক্ষেত্রে মাকড়সা মৌবাক্সে প্রবেশ করে জাল বিস্তার করে বসে থাকে এবং সুযোগ বুঝে মৌ্যমাচিকে আটক করে ধরে ফেলে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে মৌমাছি পালন ক্ষেত্রের চারধারের মাকড়সার জাল নষ্ট করে দিতে হয় এবং মৌকলোনি পরিচর্যার সময় মৌবাক্সের ভিতরে মাকড়সার উপস্থিতি বা এগুলোর বিস্ড়্গর করা জাল আছে কি-না তা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

**তেলাপোকাঃ**

তেলাপোকা সচরাচর এগুলো রাতে মৌবাক্সের ভিতরে প্রবেশ করে এবং মধু পরাগ মৌমাছির ডিম শূককীট ও মূককীট ইত্যাদি খেয়ে ফেলে। মৌবাক্সের ভিতরে প্রবেশ করার পর তেলাপোকা সাধারণত আর বের হয়ে আসতে চায় না এবং মৌবাক্সের ভিবিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এগুলোর এখানে বংশবিস্ড়্গর ও করে। মৌবাক্সের ভিতরে অবস্থান করায় মৌবাক্সের পাটাতনে এগুলোর বিষ্ঠা জমতে থাকে। এভাবে মৌবাক্সে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং এতে মৌবাক্সে ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। সুতরাং মৌকলোনি পরিচর্যাকালে মৌবাক্সের মধ্যে তেলাপোকা দেখা মাত্রই ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয় এবং এগুলোর উপদ্রব খুব বেশি দেখা দিলে এদের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য যাতায়াত রাস্তায় রাণী দরজা স্থাপন করতে হয়।

**টিকটিকি:**

টিকটিকি মৌমাছির প্রধান শত্রু। বিশেষ করে দুর্বল মৌকলোনির ক্ষেত্রে টিকটিকি ----সরাসরি মৌবাক্সের ভিতরে প্রবেশ করে এবং মৌবাক্সের দেয়ালে পাটাতনে ভিতরের ঢাকনা ও প্রধান ঢাকনার নিচে অবস্থান নেয়। সুযোগ বুঝে মৌমাছি ধরে খায় । টিকটিকি অনেকসময় রাণী মৌমাছিকে ও খেয়ে ফেলে। তাই মৌকলোনি পরিচর্যাকালে টিকটিকি অনেকসময় রাণী মৌমাছিকে ও খেয়ে ফেলে।তাই মৌকলোনি পরিচর্যাকালে টিকটিকি দেখা মাত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া এবঙ উপদ্রব বেশি হলে যাতায়াত রাস্ড়্গয় কুইনগেট স্থাপন ও দুর্বল মৌকলোনি সবলকরণের মাধ্যমে টিকটিকির আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

**রক্তচোষা পোকাঃ**

রক্তচোষা সাধারণত মৌমাছিদের আসা-যাওয়অর পথে এবং প্রবেশ পথে কর্মরত প্রহরী মৌমাছিদের ধরে খায়। রক্তচোষার উপদ্রপে প্রহরী মৌমাছিরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। ফলে যেকোনো সময় মৌকলোনিতে

মধু লুণ্ঠনের সম্ভাবনা সৃষ্ঠি হয়। নিয়মিত মৌকলোনি পরিচর্যা যাতায়াত রাসতায় কুইনগেট স্থাপন মৌপালন ক্ষেত্রের আশেপাশে রক্তচোষা দেখামাত্র মেরে ফেলা ইত্যাদি এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

**পাখিঃ**

বেশ কিছু প্রজাতির পাখি রয়েছে যারা মৌমাছির শক্র্ এগুলো মৌমাছি ধরে খায়। এগুলোর মধ্যে ফিঙ্গে মৌমাছি ভুক পাখি ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া ও কবুতর,কাক, চড়ুই, ইত্যাদি ও মৌমাছি ধরে খায়। এগুলোর মৌমাছি পালনক্ষেত্রে আশেপাশে বসে থাকে এবং মাঝে মাঝে মৌমাছি পালনক্ষেত্রের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় মৌমাছি আসা যাওয়ার কালে উড়ন্ত অবস্থায় মৌমাছিদের ধরে খায়। প্রতকিারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এজাতীয় পাখি যেন মৌপালনের ক্ষেত্রে আশেপাশে বাসা বাঁধতে না পেরে সেদিকে দৃষ্ঠি রাখাসহ এজাতীয় পাখি আশেপাশে দেখামাত্রই তাড়িয়ে দিতে হয়।

**ইঁদুরঃ**

ইঁদুর বেশ কয়েক প্রজাতির রয়েছে। প্রায় সব প্রজাতির ইঁদুরই মৌমাছির শত্রু। তবে এগুলোর মধ্যে এবং প্রজাতির ইঁদুরই মৌমাছির বেশি ক্ষতি করে। ইঁদুর সুযোগ পেলেই মৌকলোনিতে প্রবেশ করে শূককটি, মূককীট ও মোম খায়। এ ছাড়া ইঁদুর মৌবাক্সের ফ্রেম বা অন্যান্য অংশ কেটে নষ্ট কেটে নষ্ট করে। ইঁদুরের উপদ্রব দেখা দিলে ফাঁদ বসিয়ে বা বিষ প্রয়োগ করে ইঁদুর নিধন করতে হয় এবঙ মৌবাক্সের বা মৌপালন ক্ষেত্রের আশেপামে ইঁদুরের গর্ত থাকলে তা নষ্ট করে দিতে হয়।

**ব্যাঙঃ**

ব্যাঙ মৌমাছি ধরে খায়। সব প্রজাতির ব্যাঙই মৌমাছির শত্রু। তবে গেছো ব্যাঙ উড়ন্ত ব্যাঙ এবং কুনো ব্যাঙ মৌমাছিদের সর্বাধিক ক্ষতি করে। এগুলো মৌবাক্সের আশেপামে অবস্থান করে এবং সুযোগ বুঝে মৌমাছিকে ধরে খায়। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মৌবাক্সের আশেপাশে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

## সেসন ঃ ৭ (ব্যবহারিক)

- মৌ বক্স তৈরী করণ
- মৌ কলোনি স্থানান্তর
- মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করণ